Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 69 – 76
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

হিতেন নাগের নির্বাচিত ছোটগল্পে দাম্পত্য

জ্যোতিস্মিতা চক্রবর্তী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : jyotismitachakrabarti123@gmail.com

Keyword
দাম্পত্য, ভালোবাসা, কর্তব্য, সময়, বিশ্বাস, জীবন।

Abstract
'দাম্পত্য' বাংলা ছোটগল্পে প্রাসঙ্গিকভাবে প্রতীয়মান। উত্তরবাংলার বিশিষ্ট গল্পকার হিতেন নাগও তার ব্যাতিক্রম নন। মূলত প্রান্তিক মানুষদের জীবনধারা তাঁর গল্পে ফুটে উঠলেও, 'দাম্পত্য' বিষয়টি স্থান পেয়েছে তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকে ও বৈচিত্রে। কখনও দেশভাগের আসন্ন সঙ্কটে তা সমস্ত প্রলোভনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে মাথা উঁচু করে বিদ্যমান, কখনও জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়েও এক নতুন দিকের সূচক, কখনও পাশের বাড়ির চেনা গল্প, কখনও অচেনা কাহিনি। এই প্রবন্ধে তাঁর লেখা ছয়টি গল্পে দাম্পত্যের এরকম বিবিধ ধারা আলোচিত হয়েছে।

Discussion

১

কাব্য মানুষের প্রাচীনতম সাহিত্য সৃষ্টি হলেও, গল্প বলার শুরু তারও আগের। এক লক্ষ বছর আগে নিয়ানডারথাল মানুষের জীবনযাত্রায় পাওয়া উপকরণ, চতুর্থ বরফ যুগের মানুষের গুহাচিত্র থেকে সহজেই অনুমেয়- মানুষ তার আবেগ প্রকাশের মাধ্যম খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার মনে জন্ম নিচ্ছে গল্প। খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চদশ শতকের রেনেসাঁস যুগে মানুষ উপকথার জগত থেকে ফিরে আসে বাস্তবের মাটিতে। 'ক্যান্টারবেরি টেলস' ও 'ডেকামেরন' গ্রন্থ দুটিতে ভালো-মন্দ মেশানো মানুষকে পাওয়া যায়। কিন্তু আজকের রূপে সঠিক অর্থে ছোটগল্প এল আরও পরে, শিল্প বিপ্লবের পর উনবিংশ শতকে। ঘটনার বিবৃতি, নীতিশিক্ষা, রূপক, বৃত্তান্তের বাইরে গিয়ে ছোটোগল্প নিজের এক স্বতন্ত্র জায়গা নিয়ে আছে। পৃথিবীর প্রায় সব ছোটোগল্প তিনটি শ্রেণির মধ্যে একটি - প্লট প্রধান, চরিত্র প্রধান ও ইম্প্রেশন মুখ্য। বাংলা ছোটগল্পের পথপ্রদর্শক রবীন্দ্রনাথ। তিনি যথাক্রমে এর স্রষ্টা, প্রবর্তক, ও প্রথম রূপকার। তাঁর প্রথম দুটি গল্প- 'ঘাটের কথা' (ভারতী, কার্তিক ১২৯১ বঙ্গাব্দ) ও 'রাজপথের কথা' (নবজীবন, অগ্রহায়ণ ১২৯১ বঙ্গাব্দ) ছোটগল্পের প্রাথমিক রূপ যা ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়।

বর্তমান কালের বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম লেখক হলেন হিতেন নাগ। তিনি ধরাবাঁধা নদী খাতের বাইরে এক মূর্তিমান বন্যা। ১৯৩৭ সালের ২৯ শে জুন অধুনা বাংলাদেশের রংপুর জেলার ভুরুঙ্গামারীতে জন্মগ্রহণ করেন। ভুরুঙ্গামারীতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে কোচবিহারের নৃপেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। দিনহাটা কলেজ থেকে কলা বিভাগে আই.এ পরীক্ষায় জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সাম্মানিক বাংলা সহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকে তার লেখালেখি শুরু। তিনি একাধারে গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস ও অনুবাদ সাহিত্য রচনা করে গেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসের নাম 'দাও ফিরে'। এছাড়া 'কামতাপুর থেকে কোচবিহার', 'উত্তর বাংলার ভাওয়াইয়া গান', 'অন্য নেতাজী', 'অন্য মানুষ আব্বাসউদ্দিন', 'কাঁটাতারের বেড়া' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হিতেন নাগ সম্পর্কে আলোচনায় লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী বলেছেন-

> "দাপুটে গল্পকারও বটে, হয়তোবা মফসসলবাসের কারণে তিনি কম পঠিত। পাঠকের দরবারে সেভাবে হাজির হতে পারেননি।"[১]

আমি হিতেন নাগের লেখা নির্বাচিত ছয়টি গল্পে দাম্পত্য জীবন নিয়ে পর্যালোচনা করেছি।

২

'আশ্চর্য প্রতিশোধ' গল্পে দাম্পত্য জীবনের কঠোর বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। গল্প শুরু হয়েছে গল্পের প্রধান চরিত্র তমালের চারিত্রিক স্বভাবের বৈপরীত্যতা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে –

> "চিরকালের শান্ত স্বভাবে ছেলে তমাল। ভীষণ মুখচোরা। সাতচড়েওরা নেই। অথচ সেই তমাল পাগলের মত চিৎকার করে মারমুখি। উত্তেজিত।"[২]

উনিশ বছরের বিবাহিত জীবনে স্ত্রী কণা তমালকে এমন ভাবে রেগে যেতে নাকি কোনদিনও দেখেনি। গল্পের প্রতি পাঠকের আকর্ষণ বেড়ে যায় এখানেই যে কি এমন ঘটেছিল যা তমালের আচরণ বিপরীত সুর গাইলো। মা ও কনা কে নিয়ে তমালের ছিল ছোট্ট সুখী পরিবার। এ গল্পে দাম্পত্য ও মাতৃত্ব দুইয়ের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। তমালের মায়ের ছেলের প্রতি ওয়াকিবহলতা স্ত্রী কণার কাছে ধীরে ধীরে অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। তমাল অফিস থেকে ফিরলে মা বলে –

> "বউমা, ছেলের আমার মুখ দেখেছো? সোনার বরণ ছেলে আমার, কি হাল হয়েছে! মুখ শুকিয়ে কাঠ বুকের হাড় কটা গোনা যায়। হ্যাগা বৌমা অফিস যাওয়ার সময়ে তমাল ঠিক ঠিক খেয়েছিল তো?"[৩]

প্রথম প্রথম স্ত্রী কিছু না বললেও, ধীরে ধীরে যে শাশুড়ির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে দিয়েছিল, তা তমাল মনে মনে মেনে নিতে না পারলেও নিজের দাম্পত্য জীবনকে বাঁচাতে গর্ভধারিণী মাকে চিৎকার করে বলেছিল –

> "আমাকে কি তুমি শান্তিতে বেঁচে থাকতে দেবে না?"[৪]

গর্ভবতী স্ত্রীর পক্ষ নিতে গিয়ে নিজের গর্ভধারিণী মাকে কটু কথা শোনাতে হয়েছিল তমালকে।

মায়ের সেদিনের বোবা কান্না আজও চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে। কালের নিয়মে আজ কণা যখন তার সন্তানের খুঁটিনাটি নিয়ে গবেষণায় বিভোর তখন তমাল খানিক খুশি হলেও তার মনের ভেতরে পুষে রাখা আগুনটা জ্বলে ওঠে। একদিকে সে নিজেকে বোঝায়-

> "আসলে সব মায়েরাই সমান। সব মায়েরাই এক ভাষাতে কথা বলে। কণা তার ব্যতিক্রম হতে যাবে কেন।"[৫]

আর একদিকে উনিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে পুষে রাখা আগুনের লেলিহান শিখায় কণাকে গ্রাস করতে উদ্যত-

> "ওই আগুনের শিখায় কণার আহত মাতৃত্ব নরম পরাজয় বরণ করে বোবা কান্নায় পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।"[৬]

তমালের এই আশ্চর্য প্রতিশোধ কোথাও মাতৃত্ব ও দাম্পত্যের দ্বন্দ্বেরই প্রতিরূপ।

'নও শুধু ছবি' তে গল্পকার অনুপম-তপতী-শকুন্তলার দাম্পত্য জীবনের বিয়োগান্তক করুণ পরিণতি, অপূর্ণতা ও উপলব্ধির ছবি এঁকেছেন। যে অনুপম ফুলশয্যার রাতে বলেছিল -

"তুমি আছো আর আমি আছি...তুমি ছাড়া এ পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই...।"[৭]

সেই অনুপমের বুকে মাথা রেখে আজ ফুলশয্যার রাতে নববধূ শকুন্তলা। ঘুমের ঘোরে অনুপম তপতী তপতী বলে চিৎকার করে ওঠায় খানিক ঘাবড়ে যায় শকুন্তলা। একদিকে শকুন্তলা প্রাণপণে জড়িয়ে আছে অনুপমকে, অপরদিকে অবশ বিহ্বল দেহ-মনের অনুপমকে দেখে ঢাকাই জামদানি পরিহিত সিঁদুর মাথায় তপতীর বাঁকা হাসির ব্যঙ্গ বিদ্রুপ যেন ব্যর্থ দাম্পত্যের পরিহাস। মাতাল করা মিষ্টি গন্ধে রজনীগন্ধায় তখনো নাইট বাল্বের সবুজ আলো যেন দাম্পত্যের পেন্ডুলাম। ছ'মাসও পুরনো হয়নি লিউকোমিয়াতে তপতীর চলে যাওয়ার। ফটো ফ্রেমে কাঁচ বন্দি তপতী আজ জাগরী হয়ে তার দাম্পত্যের পাহারাদার রূপে ড্রেসিং টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে। যে তপতীর হাতের মুঠোয় একদিন স্বর্গ এসে ধরা দিয়েছিল, সে আজ শকুন্তলার ফুলশয্যায় কান পেতে আছে।

> "ঘরটাও প্রচন্ড রকম দুলে দুলে উঠছে অনুপম তলিয়ে যাচ্ছিল তলিয়ে যাবার আগে হাত বাড়িয়ে দেয় তপতীকে। কিন্তু দুজনের মাঝখানে তখন সীমাহীন মহাশূন্য দূরত্ব রচনা করেছে। সাধ্য কি অনুপমের ওই দূরত্ব পেরিয়ে যায়। তপতী এত কাছে। অথচ আশ্চর্য, অনুপম কিছুতেই তপতীর কাছে যেতে পারে না।"[৮]

চোখের নাগালের তপতী আজ হাতের নাগালের বাইরে। বাঁচবার শেষ চেষ্টায় যে অসহায় চিৎকার তা তপতীর দু'চোখ ভরা চরম ঔদাসীন্যের বেড়া ভেদ করতে সক্ষম হয় না। অবশ দেহটাকে তুলতে অনুপমের প্রাণপণ চেষ্টা, প্রাণপণ চেষ্টা তপতীকে পাবার। তপতীর ফটো ফ্রেমের ভেঙ্গে পরা কাঁচের টুকরোগুলো আসলে অনুপম-তপতীর দাম্পত্যের অন্তরাত্মা, যা ভেঙে চুরমার হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বিবেক দংশনের ঝাড় দিয়ে তা আর এক হয় না। তপতীহীন অনুপমের জীবন ভাঙা কাঁচের টুকরার মতই ছড়িয়ে গেছে। অনুপমের স্ত্রীকে কথা দিয়েও কথা না রাখা দাম্পত্য জীবনের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও অবহেলার প্রমাণ দেয়। ঠিক তেমনই ঝাড়ু দিয়ে কাঁচের টুকরো জড়ো করতে থাকলেও মেঝেতে পড়ে থাকা ভাঙা ফটোটাকে তুলে নেয় না অনুপম। ওই ফটো থেকে তপতীর বোবা চাহনি যেন এক বিষম দাম্পত্য জীবনের দীর্ঘনিশ্বাস।

'সংসার পাঁচালি' গল্প পঁচিশ বছরের পুরনো দাম্পত্য জীবনের চাপা আবেগ কেন্দ্রিক গল্প। বড়ো মেয়ে ঝুমার বিয়ে দেওয়ার পর হৃদয়ের গভীর শূন্যতা ও বেদনা নিয়ে ক্লান্ত চিন্তাহরণবাবু ভোরে ঘুম থেকে উঠেই স্ত্রীকে খোঁজেন। এ থেকেই দীর্ঘ পঁচিশ বছরে দাম্পত্য জীবনের অভ্যেস প্রকাশ পায়। পাশে দেখতে না পেয়ে দুশ্চিন্তায় খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে দেখেন স্ত্রী ছাদের এক কোণে কার্নিশের ধারে অন্ধকারে মিশে আছে। চিন্তাহরণবাবু ভাবতে থাকেন পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনে খোলা ছাদে স্বামী-স্ত্রী নির্জনতায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকার মত অন্তরঙ্গ মুহূর্ত আগে কোনদিনও এসেছিল কিনা। অর্থাৎ এখানে লেখক দেখাতে চেয়েছেন সংসারের যাঁতাকলে পিষ্ট সন্তানের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ বাবা-মা কিভাবে এই দুর্লভ মুহূর্তে নিজেদের হারিয়ে যাওয়া দাম্পত্য জীবনের সুপ্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছা খুঁজছেন, কিংবা ফিরে পেতেও চাইছেন।

> "চিন্তাহরণবাবু স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা স্বরে বলেন, মমতা, মনে পড়ে...। মমতা চুপ করে ছিল। আছে। আসলে নীরবতারও এক ভাষা আছে। মমতার না বলা কথার অর্থ বুঝতে চিন্তাহরণবাবুর অসুবিধে নেই।"[৯]

না বলা কথা বুঝে নেওয়ার মধ্য দিয়ে এক সফল দৃঢ় দাম্পত্য জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। তাদের মধ্যে বন্ধন এখনো দৃঢ় হলেও প্রেমের বহিঃপ্রকাশের দূরত্ব খানিকটা বেড়ে গেছে। এ গল্প দাম্পত্য জীবনের এক অদ্ভুত আত্মপলব্ধির গল্প। বিয়ের পর একে অপরের সাথে প্রেমের মূল্যবান সময় কাটাতে না পারার আক্ষেপ চিন্তাহরণবাবুকে আরো চিন্তামগ্ন করে তোলে।

> "ততক্ষণে পূবআকাশ লাল হয়ে উঠবার প্রহর গুনতে ব্যস্ত। মেঘের আড়াল থেকে মুখ বের করেছে সূর্য। পাখির কলকাকলিতে চারপাশের নির্জনতা একটু একটু করে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। আকাশের তারারা ঢুকে পড়েছে আকাশের গভীরে। পঞ্চমীর চাঁদ বলছে যাই যাই।"[১০]

তমশা মিলিয়ে গিয়ে এক নতুন উষালগ্নে চিন্তাহরণবাবু অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে মগ্ন। পুব আকাশের লালিমা তার মনেও জাগায় আশার কিরণ।

> "এমন সময়ে বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজটা কানে যেতেই চমকে উঠেছে মমতা। মমতা পা বাড়ায়। মমতার হাত চেপে ধরে বলে, কোথায় চললে?"[১১]

মমতার হাত চেপে ধরে যে বাধনহারা চিন্তাহরণবাবু আজ এত বছর পর নিজের লুকানো সত্তাকে কবর থেকে তুলে আনেন তা সংসার সংগ্রামে আবার হারিয়ে যায়। তাই যখন তিনি জিজ্ঞেস করেন –

> "কোথায় চললে?"

মমতার উত্তর আসে -

> "কোথায় আবার? তোমার সংসারের ঘানি টানতে।"

গল্পের শেষাংশে আমরা দেখি আর সব মধ্যবিত্তের মতো চিন্তাহরণ বাবুও নিজের দুঃখ কষ্ট হাসির মোড়কে ঢেকে এক প্রশ্ন তুলে দেন সকলের সামনে -

> "মরে আছি না, বেঁচে আছি, তা জানেন ভগবান।"[১২]

দাম্পত্য জীবনের সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের আরেকটি গল্প **'এম .পি. নারায়ণ চাটুজ্জের গপ্পো'**।

> "দ্যাখো মাধু, স্ট্যাটাসের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ চলে না।"[১৩]

গল্পের শুরুতেই নারায়ণ চাটুজ্জের মাধুরীকে 'মাধু' বলে ডাকাই একটা দাম্পত্য জীবনের গভীর বন্ধনের ইঙ্গিত উঁকি দেয়। এখানে নারায়ণ চাটুজ্জে যেমন একজন নামজাদা মানুষ, ঠিক তেমনি তার একমাত্র ছেলে সুদীপ্ত বিয়ের ব্যাপারে হীরের সমতুল্য। ইঞ্জিনিয়ার ছেলের দাম্পত্য জীবন যাতে সুন্দর ও সুদৃঢ় হয়, তাই বাবার লক্ষ্য স্বজাতি গৌরবর্ণা নাচ গান খেলাধুলা জানা মানানসই পুত্রবধূ।

> "নারায়ণ চাটুজ্জে কিছুতেই মনের মত মেয়ে খুঁজে পান না। রঙ মেলে তো হাইট মেলেনা। হাইট মেলে তো এডুকেশন মেলেনা। আবার এডুকেশন মিললে কো কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজ অর্থাৎ নাচ, গান, খেলাধুলায় চৌকশ মেয়ে সে নয়।"[১৪]

ছেলের অসবর্ণ, চাপা রঙের স্কুল শিক্ষিকা পাত্রী পছন্দের খবরে মাধুরী দিশেহারা ও ভীত। পাছে এই সংবাদে উচ্চ রক্তচাপের স্বামী বেসামাল হয়ে না পড়ে। যে কোন পরিস্থিতিতে প্রথমেই স্বামীর স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবনা এক আদর্শ দাম্পত্যের ছবি এঁকে দেয়। তাইতো আপ্রাণ চেষ্টা সপ্তম মেজাজের রাশভারী স্বামীকে পরিস্থিতি বোঝানোর। এম. পি. নারায়ণ চাটুজ্জে যখন ছেলের এ বিয়ে মানতে নারাজ, এমনকি একমাত্র ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করতে চায়, তখন মাধুরীকে জটিল অবস্থা সামাল দিতে স্বামীর কাছে হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলতে হয়েছে। দাম্পত্যের সঠিক বাতাবরণ ফুটে উঠেছে যখন এই পরিস্থিতিতে স্বামী নারায়ণ চাটুজ্জে মাধুরীকে বলে -

> "মাধু, খদ্দেরের ধুতি আর পাঞ্জাবিটা বের করে রেখো বিকেলে জাতীয় সংহতির সভায় যেতে হবে বুঝেছো? আমাকে আবার সভাপতি করেছে ওরা। কদিক সামলাই বলো...।"[১৫]

'দামি ছেলের নামী বাবা' ডাকসাইটে নারায়ণ চাটুজ্জে যেন খানিকটা নির্ভেজাল পত্নী - নির্ভরশীল এক ছাপোষা স্বামী রূপে ধরা দিয়েছেন গল্পে। মানুষ মাত্রই সব দিক সামলে চলতে হয় - যা কঠিন। তবে মানুষ তা শুধু নিজের নিকটতমের কাছেই প্রকাশ করে। এই 'বলো' শব্দটি যেন নারায়ণ চাটুজ্জের স্ত্রী মাধুরীর কাছে দিনের শেষে আত্মসমর্পণকেই বোঝায়।

> "স্বামীর কথা শুনে কান্না থামিয়ে কিছুক্ষণ থমকে ছিল মাধুরী, একটু পরে হো হো করে হেসে উঠলো। হাসি যেন থামে না, এমন সাংঘাতিক দমফাটা হাসি। নারায়ণ চাটুজ্জে মাধুরীকে অমনভাবে হাসতে দেখে ভীষণ ভয় পেয়েই গিয়েছিলেন।"[১৬]

ঘরে অসবর্ণ পুত্রবধূর আগমনের চরম বিরোধী নারায়ণ চাটুজ্জের 'জাতীয় সংহতি'র সভায় যাওয়াটা ভূতের মুখে রাম নামের মতই হাস্যকর। স্বামী সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ওয়াকিবহল মাধুরীর দমফাটা হাসি ভয় পাইয়ে দেয় দ্বিচারিতায় পূর্ণ এম. পি. নারায়ণ চাটুজ্জেকেও।

আমার নির্বাচিত পরবর্তী গল্পের নাম **'বাঁধ ভাঙছে'**। যা দাম্পত্য জীবনের বাঁধ ভাঙ্গাগড়ার কাহিনি। স্রোতস্বিনী তোরষা সারা শীত ঘুমিয়ে থাকলেও ভরা বর্ষায় তার কালনাগিনী রূপে কুল প্লাবিত করার ভয় দেখিয়ে চলেছে। বছর পঞ্চাশের পুরনো বাঁধ আজ ভগ্নপ্রায়। এই সংকটকালে ফেরেস্তার মতো কোচবিহারবাসীর কাছে আবির্ভূত হয়েছে গল্পের প্রধান চরিত্র তথা ইরিগেশনের নতুন অফিসার কমলেশ মাইতি। এ নামই যেন কোচবিহারবাসীর কাছে এক জিওনকাঠি।

> "শুধু একটাই ভরসা কোচবিহারের মানুষজনের। ইরিগেশনের নতুন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কমলেশ মাইতি বাঁধের দেখভালের দায়িত্বে আছেন।"[১৭]

কাজের প্রতি এমন ভক্তি ও নিষ্ঠা তার চরিত্রকে কর্তব্যপরায়ণ করে তুলেছে। রাত দিন এক করে সে কাজ করে চলেছে। যেখানে গাফিলতি পেয়েছে, তৎক্ষণাৎ মেরামত করতে তৎপর হয়েছে সে।

> "কোচবিহারের মানুষ ধন্য ধন্য করেছে ইরিগেশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কমলেশ মাইতির নামে। বলছে, হ্যাঁ, অফিসার হো তো এইসা।"[১৮]

কিন্তু কমলেশ মাইতির সংসারের প্রতিচ্ছবিটা যেন উল্টো। স্ত্রী বিপাশার স্বামীর প্রতি একরাশ অভিযোগ। এ অভিযোগ স্ত্রীকে সময় না দেওয়ার। গুচ্ছের কাজের লোক, গেটে দারোয়ান, গ্রুপ ডি স্টাফেদের সহযোগিতার পরেও বিশাল অট্টালিকায় সে বড়ো একাকিত্বে ভুগতে থাকে।

> "মনে হয় গোটা বাড়িটা হা করে তাকে গিলতে আসছে, ভয়ে সারা শরীর অবশ হয়ে আসে।"[১৯]

কমলেশকে একথা জানালে সে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল -

> "তুমি তো একসময় ভীষণ ডানপিটে মেয়ে ছিলে, শুনেছি। ইস্কুলে কলেজ স্পোর্টসে চ্যাম্পিয়ন হতে। গাছে চড়ে পেয়ারা, আম চুরি করতে। অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাস। আর সেই তুমি ভয় পাচ্ছ। গেটে দারোয়ান, সদর দরজা বন্ধ, তবুও ভয়! স্ট্রেঞ্জ!"[২০]

স্বামীর এই সংসারের প্রতি উদাসীনতা ও নিজের কর্মের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতার দ্বন্দ্ব স্ত্রী বিপাশাকে অভিমানী করে তোলে। কমলেশের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা ভেবে চূড়ান্ত ঝগড়া করতে পারে না সে। সংসার ত্যাগ করার কথা ভেবেও চলে যেতে পারে না। এ থেকে স্বামীর প্রতি মায়া ও স্নেহ দুইই ফুটে ওঠে। কিন্তু দীর্ঘদিনের স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য বা দায়বদ্ধতার ঔদাসীনত্য বিপাশার মনের গভীরের চাপা যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে তোলে।

> "এমন একটা সময়ের মুখোমুখি হয়ে অনেকদিনের পরিচিত নারী-পুরুষ কখনো টের পায় তাদের সম্পর্কের মধ্যেকার যোগাযোগের সাঁকোটা কখন যেন হারিয়ে গেছে। পারস্পরিক সম্পর্কের এ এক অসহায় অবস্থা। দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্কের রহস্য নির্ণয় যেমন অসম্ভব তেমনই সেই সম্পর্কের ভাঙ্গনও কখনো সব যুক্তি-তর্কের বাইরে উত্তরহীন কোনো প্রশ্নচিহ্নের আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়।"[২১]

স্বামীকে কাজে উৎসাহ দেওয়া তো দূর, তার শহরজুড়ে প্রশংসা তথা জয়জয়কার বিপাশার অসহ্য লাগে। একাকীত্ব তাকে কখন যেন স্বামীর বিরুদ্ধে চালিত করে -

> "সবাই হাততালি দিয়ে জয়ধ্বনি দেবে, কমলেশের নামে কিন্তু সেই জয়ধ্বনিতে অন্তত একজন গলা মেলাবে না।"[২২]

স্ত্রীর ওপর মানসিক নির্যাতনের দায়ে স্বামীকে কখনো অপরাধী বলে মনে হয় তো কখনো কাপুরুষ। মানসিক অবসাদে সুইসাইডের কথা ভেবেও নিজেকে সামলে নিয়ে প্রতিশোধি হয়ে উঠতে চায় নিজেই। এই একাকিত্বের জ্বালা তাকে পরপুরুষের প্রতি খানিক দুর্বল করে তোলে, গেটে দাঁড়ানো দারোয়ানকে সে আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। একাকিত্বের এই দাম্পত্য জীবনে দারোয়ানের গ্রাম্য জীবনের গল্প শোনা ছিল যেন এক টুকরো শান্তির ছোঁয়া, বিপাশা দারোয়ানের স্ত্রীর একাকিত্বের যন্ত্রণার সাথে নিজের অবস্থার তুলনা করেছিল।

> "বিপাশা হঠাৎ দু'হাতে সুখেশ্বরের হাতটা চেপে ধরে। বলে, সুখেশ্বর মালতির কোনো দোষ নেই। ও যে কেন তোমাকে ছেড়ে গেছে তা যদি জানতে, ওর বুকের মধ্যে যে যন্ত্রণাটা প্রতিদিন ওকে কুরে কুরে খেয়েছে সে খবর তুমি রাখোনি। তা বুঝবার চেষ্টাও করোনি।"[২৩]

মেম সাহেবের এ মত আচরণে সুখেশ্বর অপ্রস্তুত হলেও মালতি যেন ভীষণ বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল সুপ্ত কামনা বাসনার বহিঃপ্রকাশ করতে চেয়ে। স্বামীকে কাছে না পাওয়া যেন তাকে কুরে কুরে খেয়েছে। কিন্তু বাঁধ দেওয়ার কারিগর কমলেশ শেষে পরিস্থিতির সামাল দেয়। সে দেরিতে হলেও উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে দুজনের সম্পর্কেও যে পাঁচিল বা বাঁধ তৈরি হয়েছে তা আজ ভেঙে ফেলার দিন। পাহাড়ি নদীর তোরষাকে বশ করার মন্ত্রটা যেমন কমলেশ ঠিক জানে, তেমনি নিজ স্ত্রীকে ভালোবাসা দিয়ে আপন করে নিতেও জানে। দাম্পত্য জীবনের সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি গল্পকার সমাধানও নিজেই এঁকেছেন আপন ছন্দে। ফিকে হয়ে যাওয়া দাম্পত্যেও যেন নতুন ভালবাসার চারা বপন করেছেন গল্পকার।

'অনুপ্রবেশ' গল্পে রয়েছে দাম্পত্য জীবনের বিচ্ছিন্ন না হতে চাওয়ার আকুতি। গল্পের শুরুতে দেখা যায়-

> "আর ঠিক তখনই উঠোনের ওপার থেকে চিৎকার ভেসে আসে বউ-অ-বউ...। গলার স্বরটা যে কাদেরের তা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়।"[২৪]

দাম্পত্য জীবনের একে অপরের প্রতি গভীর টান ও বন্ধনের বর্ণনা দিয়েছেন গল্পকার। একমাত্র স্ত্রীর গলার স্বর শুনে বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি স্বামী কাদেরের কোনো নিশ্চিত সমস্যা হয়েছে। এরপর গল্পের ট্র্যাজেডি শুরু হয় যখন কাদের জানায়-

> "আজব কথা শুইনা আইলাম বউ, কাঁটাতারের বেড়া দিয়া বর্ডার ঘিরা দিব..."[২৫]

কিন্তু স্ত্রী মর্জিনা এ কথার মর্ম বুঝতে পারেনা, আবার বুঝতে চায়ও না। সে নির্দ্বিধায় জানান দেয়-

> "বর্ডার বেড়া দিব? দিউক না, আমাগো কি?"[২৬]

বউয়ের এরকম উদাসীনতায় কাদের রাগান্বিত হলেও মর্জিনার যেন কোন ভ্রুক্ষেপে নেই। উল্টে তার ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি খেলে। আসলে মর্জিনার বাইরের রাজনীতি নিয়ে কোনো মাথা ব্যাথা নেই। সে শুধু স্বামীর সাথে সংসার করতে চায়। এত বড় দুর্দিনেও সে স্বামীর কল্যাণ খুঁজেছে, ভেবেছে বর্ডার বেড়া দিলে হয়তো ওপারের কৃষক এপারে আসতে পারবে না, ফলে কাদেরের রোজগার বাড়বে। এমন সুন্দর সুখী দাম্পত্যে গল্পকার বাঁধা এনেছেন রাজনৈতিক কারণে। কাদেরের বাড়ির গা ঘেঁষে বয়ে চলছে ফুলকুমার নদী।

> "এপারের নদী। সীমানা কারে বলে নদী তা জানে না। অবলীলায় ঢুকে পড়েছে ওপারে। কিছুদূরে গিয়ে ফুলকুমার হারিয়ে যায় প্রাচীন বটগাছটার আড়ালে। আর ওখানেই ফুলকুমারে গা ঘেঁষে মর্জিনার বাপের বাড়ি। এপারে দাঁড়িয়ে দিব্যি দেখা যায়।"[২৭]

এক বছর আগে মর্জিনা 'শাওনে বিষ্টি মাথায় নিয়ে' ওপার থেকে এসে সেই যে ঘর বেঁধেছে এখন এ দেশই তার আপন দেশ হয়ে উঠেছে। স্বামীগৃহ ছাড়তে হবে শুনে, সে হাউমাউ করে কেঁদে তার দুঃখের বহিঃপ্রকাশ করেছে। সে স্বামীর সঙ্গ না ছাড়তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

> "আমি মইরা যামু তাও সই, আমি তোমারে ছাইর‍্যা যামু না...যামু না... যামু না...।"[২৮]

গ্রামের প্রভাবশালী মণ্ডল খুড়োর কাছে সাহায্যের হাত চাইলে, সেও এই পরিস্থিতির ও ক্ষমতার সুযোগ নিতে চায়। কিন্তু মর্জিনা সে প্রতিব্রতা নারীরূপে এ গল্পে বিরাজমান। স্বামীকে সবটা জানালে স্বামীর প্রতিক্রিয়া না দেখে সে খানিক বিরক্ত হয়। আসলে কাদেরের মর্জিনার প্রতি অগাধ বিশ্বাস এখানে ফুটে উঠেছে। বিশ্বাসই তো সুখী দাম্পত্যের মূল উপকরণ। বিশ্বাস এখানে এতটাই দৃঢ় যে সন্দেহ দানা বাঁধতে পারেনি, শুধু তাই নয়, বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালনে ত্রুটি হয়নি কাদেরের। অভাবের সংসারে তাদের সুখ ছিল ষোল আনা। তবে স্ত্রীর অপমান স্বামী হিসেবে কাদের মুখ বুজে সহ্য করেনি। রক্ষাকর্তার মত মণ্ডল কে জানিয়েছে, অনুপ্রবেশকারী আসলে কে। যারা রুটি রোজগারের

জন্য এই দেশে এসেছে, নাকি যারা বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে প্রবেশ করে ভোগের লালসায় পরস্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয় সে।

> "প্রথম কিসিম অনুপ্রবেশ ঠেকাইবো বিএসএফ আর দ্বিতীয় কিসিম অনুপ্রবেশ ঠেকাইবো আমার এই পাটকাটা বেকি... বেমরশুমে বেকিতে ধার দেই ক্যান জিগাইছিলা না? অহন বুইঝা দ্যাখো...।"[২৯]

৩

হিতেন নাগের লেখনীতে মানুষের জীবন ধরা দিয়েছে নানা আঙ্গিকে। ছোটগল্পের ভিত্তি মূলত যে তিনটি ধারায় দেখা যায়, হিতেন নাগ আরোহন করেছেন সবটাতেই। আমার নির্বাচিত ছোটগল্পগুলিতে দাম্পত্য এসেছে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বর্ণময় বৈচিত্র নিয়ে। কোথাও সাধারণ গৃহস্থ বাড়ির ঘরকন্না, কোথাও সম্পর্কের জটিলতা দাম্পত্যের বিভিন্ন রূপ তুলে ধরেছে।

দাম্পত্য শুধুমাত্র সহবাস ও ঘর সাজানো নয়। তার শিকড় আরো গভীরে প্রোথিত। এই প্রসঙ্গে অশোক কুমার দে বলেছেন-

> "নরনারীর পারস্পরিক ও সামাজিক সম্পর্ক, তাদের যৌথ-জীবন তথা দাম্পত্য সম্পর্ক সামগ্রিক ভাবে নর-নারীর জীবনবোধ রূপে অভিহিত হতে পারে। নর-নারীর মিলিত জীবন বৃত্ত তাদের গভীর জীবনস্পৃহা ও মানবিক চেতনাই এই জীবন বোধের বিভিন্ন দিক। এই জীবনবোধ প্রধানত জীবনের কোন বহিরাঙ্গ বিষয় নয় বরং একে মানব জীবনের অন্তরঙ্গ বিষয় বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।"[৩০]

তাই হয়তো কেউ ফিরে আসে মৃতা স্ত্রীর ছবি হয়ে, কেউ জীবনসায়াহ্নেও খুঁজে পেতে চায় চাপা আবেগ। আবার কোনো ক্ষমতাবান মানুষকেও আত্মসমর্পণ করায় জীবন-সঙ্গিনীর কাছে, কখনো অসহায় মানুষের চরিত্র রক্ষার ঢাল আবার বাঁধনহারা ভালোবাসার এক নতুন পথের দিশারী। গল্পকার হিতেন নাগ দাম্পত্যের যে বাস্তবিক সরল ও যথার্থ চিত্রায়ণ করেছেন তা অতুলনীয়।

তথ্যসূত্র :

১. উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৬ই মার্চ, ২০২২, (চক্রবর্তী, স্বপ্নময়) শিলিগুড়ি, পৃ. ৬
২. নাগ, হিতেন, হিতেন নাগ গল্প সমগ্র, এখন ডুয়ার্স, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ১৪
৩. তদেব, পৃ. ১৫
৪. তদেব, পৃ. ১৬
৫. তদেব, পৃ. ১৭
৬. তদেব, পৃ. ১৭
৭. তদেব, পৃ. ৩৪
৮. তদেব, পৃ. ৩৩
৯. তদেব, পৃ. ৪২
১০. তদেব, পৃ. ৪২
১১. তদেব, পৃ. ৪২
১২. তদেব, পৃ. ৪৩
১৩. তদেব, পৃ. ১৯৩
১৪. তদেব, পৃ. ১৯৪
১৫. তদেব, পৃ. ১৯৫
১৬. তদেব, পৃ. ১৯৫

১৭. তদেব, পৃ. ২৩১
১৮. তদেব, পৃ. ২৩২
১৯. তদেব, পৃ. ২৩২
২০. তদেব, পৃ. ২৩২
২১. গিরি, সত্যবতী ও সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত), প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, ২য় খণ্ড, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৬০৭
২২. নাগ, হিতেন, হিতেন নাগ গল্প সমগ্র, এখন ডুয়ার্স, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ২৩৩
২৩. তদেব, পৃ. ২৩৭
২৪. তদেব, পৃ. ২৪৩
২৫. তদেব, পৃ. ২৪৩
২৬. তদেব, পৃ. ২৪৩
২৭. তদেব, পৃ. ২৪৪
২৮. তদেব, পৃ. ২৪৪
২৯. তদেব, পৃ. ২৪৯
৩০. দে, অশোককুমার, বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১, ১৯৭১, পৃ. ৫২

গ্রন্থপঞ্জী :

আকর গ্রন্থ :

১. নাগ হিতেন, হিতেন নাগ গল্প সমগ্র, এখন ডুয়ার্স পরিবেশনা, কলকাতা, ২০২২

সহায়ক গ্রন্থ :

১. দাশ, শিশিরকুমার, বাংলা ছোট গল্প, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ১৪২৯
২. মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার (সম্পাদনা), গল্পচর্চা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ২০১৮
৩. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ কুড়ি বছর, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১৬
৪. গিরি, সত্যবতী ও সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত), প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, ২য় খণ্ড, রত্নাবলী কলকাতা ১৯৯৭
৫. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ছোটগল্পের সীমারেখা, প্রকাশ ভবন, কলকাতা ১৯৬৯
৬. গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তনু, ছোট গল্প তথ্য সন্ধান ও সমালোচনা চিন্তা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ কলকাতা ২০১২